গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২২ সংখ্যা ১০ জানুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

প্রায় প্রতিদিন রেলদুর্ঘটনা ঘটছে

রেলমন্ত্রীর অপসারণ চাই

— নীহার মুখার্জী

সেকেন্দ্রাবাদ ও মানমাদের মাঝে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও বেদনা প্রকাশ করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

"সেকেন্দ্রাবাদ ও মানমাদের মাঝে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার সংবাদে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এই দুর্ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৫০ জনের বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের বক্তব্য অনুসারে এই সংখ্যা বহুগুণ বাড়তে পারে।

বর্তমান সরকারের রাজত্বে রেল দুর্ঘটনা এখন প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। তাই আমাদের দাবি রেলমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে অবিলম্বে মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত করতে হবে।

আমরা দাবি করছি, রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহতদের প্রত্যেককে ২ লক্ষ এবং আহতদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে।

আমরা আরো দাবি করছি, এই দুর্ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

এই দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারবর্গ এবং আহতদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

দোষী পুলিশদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ জানুয়ারি নিম্নলিখিত বিবৃতিতে বলেন ঃ

"পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত বিপন্ন মহিলার সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের বর্বর আক্রমণে গুরুতর আহত বাপী সেনকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাতে হল। এই মর্মান্তিক ঘটনা পুনরায় দেখিয়ে দিল এ রাজ্যের প্রশাসনের হাল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিহতের পরিজনদের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শুধু দোষী পুলিশদের লোক দেখানো কিছু শাস্তি দিলেই হবে না, এই মর্মান্তিক ঘটনার গভীরে ঢুকতে হবে। সি পি এম নেতৃত্ব পুলিশবাহিনীকে দলীয় লেজুড়ে পরিণত করায় এই বাহিনীর এক অংশ আইনের রক্ষক হয়েও দুপায়ে আইন মাড়িয়ে খুন-ডাকাতি-ঘুষ-ধর্ষণ নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছে, যেটা বন্ধ করতে না পারলে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আরও ঘটতে থাকবে।

আমরা এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও নিহত বাপী সেনের পরিজনদের উপযুক্ত আর্থিক পুনর্বাসন দাবি করছি।"

জলকরের বোঝা

গরিব-মধ্যবিত্তের ঘাড় ভাঙার সরকারি নীতি

রাজ্যের পুরসভাগুলির লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নাগরিকের উপর বিপুল হারে জলকর চাপানোর সরকারি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এস ইউ সি আই ১ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং জলকর ঘোষণার কালা সার্কুলার পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এই জনস্বার্থবিরোধী ও অমানবিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। একেবারে গরিব বস্তিবাসী থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত কাউকে রেহাই না দিয়ে বিপুল পরিমাণ জলকর বসানোর আগে সি পি এম নেতারা যে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছে, জলকরের সমর্থনে তৃণমূল মেয়র সুব্রত মুখার্জীর কথাতেই তা স্পষ্ট।

পুরমন্ত্রী ও সি পি এম নেতা অশোক ভট্টাচার্য এবং তৃণমূল মেয়র এক সুরে বলেছেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

১৯৮৫ ঃ জলকরের প্রতিবাদ

১৯৮৫ সালে বামফ্রন্ট পরিচালিত কলকাতা পুরসভা বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে জলকর বসানোর প্রস্তাব আনে, তার বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল এস ইউ সি আই। (ইনসেটে) ৩১ ডিসেম্বর'৮৫ মিছিলের আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড রণজিৎ ধর, পাশে কমরেড অনিল সেন।

২০০৩ ঃ জলকরের প্রতিবাদ

১ জানুয়ারি'০৩ কলকাতা পুরসভার সামনে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ। জলকরের কালা সার্কুলারের প্রতিলিপিতে আগুন দিচ্ছেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রমিক নেতা কমরেড শঙ্কর সাহা।

২৭ জানুয়ারি

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, হাসপাতালের চার্জ ও শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, কোর্ট ফি ও কর বৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই, সর্বনাশা নয়া কৃষিনীতি, ফসলের দাম না পাওয়া, জলকর বসানো, খুন-সন্ত্রাস ও দুর্নীতির প্রতিবাদে,

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

ধর্মঘট

হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি ঃ সিউড়িতে বিক্ষোভ

সিউড়ি সদর হাসপাতালে চার্জ প্রত্যাহার ও বিনাব্যয়ে চিকিৎসার উন্নতির দাবিতে ২৭ ডিসেম্বর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি, হুসনাবাদ শাখার উদ্যোগে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষের সুসজ্জিত মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে এবং হাসপাতাল সুপারের কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ সমাবেশে সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মানস সিংহ, তাপস সিংহ ও স্বাধীন দলুই।

হরিহরপাড়ায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশন

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়ায় গত ২৫ ডিসেম্বর প্রায় সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা।

কনভেনশন আরম্ভ হয় এলাকার মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেত্রী পূর্ণিমা কর্মকারের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মূল প্রস্তাব পাঠের মধ্য দিয়ে। কমিউনাল হারমনি কমিটির জেলা সভাপতি শ্রী প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সহ সালার কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল গুপ্ত, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুশীল কুমার ঠাকুর, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দেবী ঠাকুর এবং সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা প্রতিমা সিরাজ প্রমুখ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

সর্বশেষে এলাকায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার মহাশয়কে সভাপতি এবং পূর্ণিমা কর্মকারকে সম্পাদিকা করে অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমনি কমিটির হরিহরপাড়া থানা শাখা গঠিত হয়।

ছত্তিশগড়ে ছাত্র আন্দোলনের জয়

রবিশংকর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি ১০% বৃদ্ধি এবং পরীক্ষার তারিখ একমাস এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা ভারত ডি এস ও-র ছত্তিশগড় রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গত ৯ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে শত শত ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইতিপূর্বে দাবিগুলির সমর্থনে দেড় সহস্রাধিক স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেন। এরপর উপাচার্য গত ১৭ ডিসেম্বর পরীক্ষা এক মাস এগোনোর ঘোষণা প্রত্যাহার করেন। এই আন্দোলনে কমরেড বিশ্বজিৎ হারোড়ে, লীলাময় মণ্ডল, আত্মারাম সাহু, মহেন্দ্র সাহু, প্রতাপ সিংহ, সুব্রত সানা, গোপীনাথ মরকাম, বিভূতি ভূষণ, রাজু গোপ, অজয় কুররে, ক্রান্তিকুমার, মাধব বর্মা, অজয় দেবাঙ্গন, কুমারী শ্রদ্ধা প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরিচারিকা সমিতির উদ্যোগে

সল্ট লেকে দাতব্য চিকিৎসা শিবির

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতায় সল্ট লেক এ.ই. ব্লকে কর্মরত পরিচারিকাদের চিকিৎসার্থে গত ২৯ ডিসেম্বর এক স্বাস্থ্যশিবির তাঁরা পরিচালনা করেছেন। শিবিরে শতাধিক পরিচারিকা ও তাঁদের আত্মীয়দের চিকিৎসা করা হয়েছে। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অংশুমান মিত্র ও ডাঃ সুদীপ চক্রবর্তী এবং তিনজন সিনিয়র নার্সের উপস্থিতিতে এই স্বাস্থ্যশিবিরে রোগীদের ৫০০০ টাকার ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। শিবিরে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি এবং এ.ই. ব্লকের সমাজকল্যাণ সমিতির সম্পাদক মণিময় সাহার সার্বিক সহযোগিতার বিশেষ উল্লেখ করে তাঁরা জানিয়েছেন, এলাকায় এই স্বাস্থ্যশিবির দারুণভাবে সাড়া ফেলেছে।

দাতব্য চিকিৎসা ছাড়াও পরিচারিকাদের জীবনের নানা সমস্যা, বিশেষ করে সরকারি ভবিষ্যনিধি, বার্ধক্যভাতা, সাপ্তাহিক সবেতন ছুটি ইত্যাদির দাবি নিয়ে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

ভরতুকি দিয়ে সস্তায় গম রপ্তানি

সরকারি গুদামে জমে যাওয়া ৬৪.৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের বিপুল ভাণ্ডার (গম ৪১.৩ লক্ষ টন, চাল ২৩.৪ লক্ষ টন) খালাস করতে কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি দিয়ে বিদেশে সস্তায় গম বেচে দিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার গম ৪,১৫০ টাকা টন, অর্থাৎ ৪ টাকা ১৫ পয়সা কিলো দরে বিক্রি করছে শুধু নয়, রপ্তানির উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণও তুলে দিচ্ছে। দেশের শক্তিশালী কৃষি পুঁজিপতিগোষ্ঠীকে খুশি রাখতে সরকার তাদের কাছ থেকে বেশি দামে গম কিনেছে, কিন্তু সস্তায় দেবার বেলায় দেশের মানুষকে দিচ্ছে না। কারণ তাহলে দেশের বাজারে গমের দর পড়ে যাবে, ব্যবসায়ীদের মুনাফায় টান ধরবে। এইভাবে অভুক্ত দেশবাসীকে বঞ্চিত করে তারা কৃষি পুঁজিপতিদের ভর্তুকি দিচ্ছে। এ-থেকেই বোঝা যায় মুখে হিন্দুত্বের বুলি আওড়ালেও এ সরকার হিন্দু মুসলমান গরিব মধ্যবিত্তের নয়। এ সরকার ধনীদের — জনগণকে শুষে মুনাফা করাই যাদের পরম ধর্ম।

সুদের হার কমায় লাভ কার ?

ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করে দফায় দফায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে সঞ্চিত আমানতের ওপর সুদের হার কমিয়ে দিচ্ছে। ২০০১-'০২ ও ২০০২-'০৩ আর্থিক বছরে দু'-দু'বার সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই ব্যাঙ্কে জমা টাকার সুদের ওপর যাঁদের জীবন নির্ভরশীল, অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু প্রবীণ নাগরিকেরাই নন, এই তীব্র বেকার সমস্যার যুগে যেসব পরিবারের যুবকরা উপার্জন করার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, সেই সব পরিবারগুলিও জমিয়ে রাখা টাকা ক'টির ভরসাতেই জীবন কাটাবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু সুদের হার ক্রমাগত কমতে থাকায় তাঁদের মধ্যেও প্রবল অনিশ্চয়তাবোধ কাজ করছে।

সঞ্চিত আমানতের উপর সুদের হার কমানোর কারণ হিসাবে সরকার বলেছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে সুদের হার বেশি হওয়ায় শিল্পে উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়েছে, শিল্পপতিরা বিনিয়োগের জন্য ঋণ নিচ্ছেন না, ফলে বিনিয়োগ হচ্ছে না। সুদ কমালে শিল্পোন্নয়ন ঘটবে। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী দেশে জিনিসপত্রের দাম নাকি বাড়ছে না, ফলে সুদের হার কমলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে না। বাস্তবে পরিবহনের ভাড়া, বিদ্যুৎ, ওষুধের দাম, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যয় চড়চড় করে বাড়ছে। কিন্তু সরকার যে বলেছিল বিনিয়োগ বাড়বে, তা বেড়েছে কি ? না, বাড়েনি।

সম্প্রতি 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি' (CMIE) নামক সংস্থাটি সমীক্ষা করে গত ১ বছরে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক মন্দার প্রবল প্রভাব পড়েছে। তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, গত বছরে, ১ লক্ষ ৭২ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা মূল্যের ৯৭টি প্রকল্প আর্থিক মন্দার কারণে বাতিল করতে হয়েছে। ২০০২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিনিয়োগের হার ২০০১ সালের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ কম। বিদ্যুৎ, সার এবং পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের পরিমাণ সবচেয়ে কম।

অন্যদিকে তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক ঋণের সুদ বাবদ খরচ কমায় ভারতীয় শিল্প মালিকরা ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৫০০ কোটি টাকা বাড়তি পেয়েছে, যেটা তাদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়েছে। ২০০১ সালে যখন প্রথমবার সুদের হার কমানো হয়েছিল, তখনই এই খাতে ভারতীয় একচেটিয়া শিল্পপতিরা ৪০০০ কোটি টাকা বাড়তি লাভ করেছিল। এর পরে দ্বিতীয়বার সুদের হার কমায় তাদের মুনাফা উঠে এল আরো ১৫০০ কোটি টাকা। এ'বছরে ভারতীয় শিল্পপতিদের লাভের খাতার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কম সুদের কারণে বেঁচে যাওয়া এই টাকা।

ফলে দেখা যাচ্ছে, মন্দার দোহাই দিয়ে শিল্প বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে, কিন্তু মালিকদের মুনাফা কমছে না। এ বছরেই একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর নিট মুনাফা শতকরা ৪৫.৮০ ভাগ বেড়েছে। মন্দার বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে, বেকারি, দারিদ্র্য ও এমনকি আত্মহত্যার পথে শ্রমিক-চাষিদের ঠেলে দিয়ে মালিকদের মুনাফার স্বার্থরক্ষার পবিত্র কাজটি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ এই সরকার মালিকদের সরকার। শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের এদের প্রতি আস্থা রাখার কোনও কারণই নেই। (সূত্র ঃ দ্য স্টেটসম্যান, ১১.১১.০২, ১৯.১১.০২)

বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে

ন্যালকো শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছেন

৩১০০০ শ্রমিকের রুজি-রোজগার ও বছরে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি লাভ যোগায় যে ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী (ন্যালকো), সেটি বেসরকারি মালিকের কাছে বেচে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ন্যালকো শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। ওড়িশার সর্বস্তরের মানুষ ন্যালকো শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, বিড়লা গোষ্ঠীর সংস্থা হিণ্ডালকো-র হাতে ন্যালকো তুলে দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-এল এস, এ আই টি ইউ সি, ইনটাক, সিটু, এইচ এম এস এবং ন্যালকো শ্রমিক ইউনিয়ন মিলে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে।

চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী ন্যালকো বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে জেলা ও রাজ্যস্তরে কনভেনশন, রাজধানী ভুবনেশ্বরে যৌথ বিক্ষোভ মিছিল এবং ওড়িশা বন্‌ধ-এর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর নয়া দিল্লীর কনস্টিটিউশন ক্লাবের ডেপুটি স্পিকার হলে জাতীয় স্তরের কনভেনশন হয়েছে। কমরেডস্ রঘুনাথ দাস (ইউ টি ইউ সি-এল এস), সৌরিবন্ধু কর (এ আই টি ইউ সি), রামচন্দ্র খুঁটিয়া (আই এন টি ইউ সি), রাধারমণ ষড়ঙ্গী (সিটু) এবং বি পি দাসকে (এইচ এম এস) নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশন পরিচালনা করেন। ইউ টি ইউ সি-এল এসের পক্ষে অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা বলেন — এই বেসরকারীকরণ পুরোপুরি অযৌক্তিক, এর সঙ্গে বৃহত্তর জনস্বার্থের বা শ্রমিক স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন — দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বার্থে, তাদের নির্দেশেই বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। ন্যালকো শ্রমিক, ওড়িশার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

২৮ নভেম্বর নয়া দিল্লীর যন্তরমন্তর স্কোয়ারে গণধরনা দেওয়া হয়।

শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে

শিক্ষা আজ ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। ভারতবর্ষে এখন বছরে ৬ কোটি শিশু স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। ভর্তি হয়েও ৫ম শ্রেণীর মধ্যে পড়া ছেড়ে দেয় ৪০.২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ৮ম শ্রেণীর মধ্যে হারিয়ে যায় ৫৪.৫ শতাংশ, আর ১০ম শ্রেণীর মধ্যে ৬৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা-জীবন শেষ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে ড্রপ আউটের সংখ্যা এর চেয়েও বেশি। সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, এই সংখ্যা ৫ম শ্রেণীতে ৫৫ শতাংশ, ৮ম শ্রেণীতে ৭১ শতাংশ এবং ১০ম শ্রেণীতে ৮২ শতাংশ।

এই পরিস্থিতিতে এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার শিক্ষার সর্বস্তরেই ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বাড়ানো হয়েছিল গত বছরই, মাসিক ১৪ টাকা - ১৭ টাকার ফি বেড়ে হয়েছে ৫০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাতে ফি বেড়েছে মাসিক ৪০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা। আর আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই বাড়ানো হচ্ছে মেডিকেল শিক্ষার ফি। তার পরিমাণ মাসিক ১০০০ টাকা (এখন যার পরিমাণ ১৮ টাকা) এবং হোস্টেলের সিট রেন্ট করা হচ্ছে মাসিক ৫০০ টাকা (এখন যার পরিমাণ ১২ টাকা)। শুধু তাই নয়, মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে, যেগুলিতে মোটা অঙ্কের ডোনেশন নিয়ে ভর্তি করা হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তাঁরা স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রেও ফি বাড়াবেন, অষ্টম শ্রেণীর পর শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করতে হবে ছাত্রদেরই।

ফি-বৃদ্ধির অজুহাত হিসাবে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন নেতা-মন্ত্রীরা একটা যুক্তিই তুলছেন, সরকার টাকা দেবে কোথা থেকে? অথচ সত্যিই কি সরকারের টাকা নেই? নিছক গদিতে টিকে থাকার জন্য কেন্দ্রে এন ডি এ জোট সরকার এবং রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের সব শরিককে খুশি করতে এক একটা দপ্তরকে কেটে কেটে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে জাম্বো মন্ত্রিসভা বানানো হয়েছে। তাঁদের জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এ টাকা আসে কোথা থেকে? জনগণ না খেয়ে মরছে আর তাদের পয়সায় মন্ত্রীরা বাড়ি গাড়ি ফোন বিলাসিতায় দিব্যি দিন কাটাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কি কাজ করছে সেই উন্নয়নের ফিরিস্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দপ্তর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তার জন্য খরচ হয় মাসে ৫ লক্ষ টাকা। আর তাঁর জন্য বরাদ্দ তিন নম্বর গাড়ির জন্য তেল খরচ হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, যে সরকার জনগণকে প্রদত্ত ভরতুকি টাকার অভাবের অজুহাতে তুলে দিচ্ছে, সেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গোয়েঙ্কা পরিচালিত বিদ্যুৎ সংস্থা সি ই এস সি-কে ২৬৬ কোটি টাকা ভরতুকি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাভাবে কাতর অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত আবার রিলায়েন্স ইণ্ডাস্ট্রিজকে ১৫০ কোটি টাকা ছাড় দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর জন্য তো বুদ্ধদেববাবুদের টাকার অভাব হয় না!

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে দলবল নিয়ে উঠেছিলেন নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে; যেখানে এক রাত থাকার খরচ ১০,০০০ ডলার। সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ছিলেন ৭,৫০০ ডলার মূল্যের হোটেলে এবং মোশারফ যে হোটেলে ছিলেন তার দৈনিক খরচ ২,০০০ ডলার। তার উপর টাটা, বিড়লা, আম্বানি, গোয়েঙ্কা এবং বাজাজদের এক লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া কর ও ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় করেনি। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে প্রতি বছর কত শত কোটি টাকা নয় ছয় হয় তার হিসাব কে রাখে? ভারতবর্ষের মিলিটারি বাজেট এখন ৭৮,০০০ কোটি টাকা। এ রাজ্যের পুলিশ বাজেটও বেড়ে হয়েছে ১০০০ কোটি টাকার চেয়েও বেশি। এই টাকা আসছে কোথা থেকে? পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এদেশে রোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্য রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয় সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না। ... অথচ এদেশে শাসনব্যবস্থায় অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। আয়ব্যয়ের অজস্র পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্যের ধনী দেশকেও ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ... হতভাগা আমরা পুলিশ ও ফৌজ বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টের কণা খুঁটে বিদ্যার ঠাট বজায় রাখছি ফাঁকা মালমশলায়।' আর আজ স্বাধীন দেশের স্বদেশি সরকার উচ্ছিষ্টের কণাটুকুও শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে নারাজ।

আজ সবচেয়ে মারাত্মক প্রবণতা হল, জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যে সরকারেরই দায়িত্ব সেটাই তারা আজ সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে একথা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস, জনতা, যুক্তফ্রন্ট, বি জে পি — সমস্ত সরকারই সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে, এমনকি যারা নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেন, সেই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কণ্ঠেও আমরা একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তাই শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ যেমন কমতে কমতে ১.১৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, তেমনি রাজ্য সরকারও শিক্ষকদের বেতন ছাড়া আর কোন অর্থই বরাদ্দ করছে না। অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষকদের সেই বেতনটাও আর যাতে না দিতে হয় তারও ব্যবস্থা তারা করে চলেছে। পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে। আংশিক সময়ের শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে ছাত্রদের বেতন থেকেই। অথচ স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে গঠিত বি জি খের শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৬৮ সালের কোঠারি কমিশন সুপারিশ করেছিল শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে। কোঠারি কমিশন এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টরূপে বলেছিল যে 'শিক্ষার ফি-কে আয়ের উৎস হিসাবে গণ্য করা অনুচিত। কর আদায়ের এটি একটি অত্যন্ত জনবিরোধী রূপ, সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর উপরই যে বোঝাটা বেশি করে পড়ে। .... সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ফি-র উপর নির্ভর না করে অন্য কোন খাতে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে এই অর্থের সংস্থান করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই অবৈতনিক হয়। এই কর্মসূচির রূপায়ণ একটা সময়সীমার মধ্যেই করতে হবে এবং প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে ফি মকুব করতে হবে। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেশিরভাগ দেশেই স্কুল শিক্ষা পুরোপুরি অবৈতনিক। সোভিয়েত ইউনিয়নে (তখন সমাজতান্ত্রিক ছিল — সম্পাদক) প্রাথমিক স্তর থেকে গবেষণা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ছিল অবৈতনিক।'

এটা শুধু '৬০-এর দশকের ঘটনা নয়। শ্রীলংকার মতো গৃহযুদ্ধে বিদীর্ণ গরিব দেশেও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। ভারতবর্ষেরই একটি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়া রাজ্য হিমাচল প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু আছে। এছাড়া সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে বহু রকমের স্কলারশিপের সুযোগ।

শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দিয়ে সরকার পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)-তে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। নরসীমা রাও-এর আমলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিল এনে বেসরকারি মালিকদের বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অধিকার দেওয়া হয়েছে, শুধু ১০ কোটি টাকার গ্যারান্টি মানি থাকলেই হল। ছাত্রদের বেতন থেকে শুরু করে শিক্ষার সিলেবাস — সমস্ত কিছুই নির্ধারণ করবে ব্যক্তিমালিকরাই। এমনকি যে কোনও সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ারও অধিকার থাকবে মালিকদের হাতেই। কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত পুন্নাইয়া কমিটি সুপারিশ করেছে, সাধারণ কলেজগুলিকে ক্রমাগত 'সেল্ফ ফিনান্সিং' কলেজে পরিণত করতে হবে। বিজেপি জোট সরকার দু'জন শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি ও কুমারমঙ্গলম বিড়লাকে দিয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম। এবং স্বাভাবিকভাবেই এই কমিশন শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত অনুদান বন্ধ করে দিয়ে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই বাজারি পণ্যের নিয়মের উপর ছেড়ে দিতে বলেছে। এতে সুস্পষ্টরূপেই বলা হয়েছে যে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের ফি বেসরকারি কলেজের ফি-র সমান করে দিতে হবে, না হলে ছাত্রছাত্রীরা বেসরকারি কলেজে ভর্তি হতে আসবে না। এমনকি ছাত্ররা যাতে উচ্চহারে ফি দিতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে ছাত্রদের লোন দিতে বলেছে, যাতে মালিকদের মুনাফা সুনিশ্চিত হয়।

রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারও পিছিয়ে নেই। তারাও বিড়লা-আম্বানি কমিশনের সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে ৩৭টি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ খোলার জন্য রাজ্য সরকার পিয়ারলেসকে প্রায় বিনা পয়সায় জমি দিয়েছে। বেসরকারি আইন কলেজ খোলা হয়েছে। এমনকি বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ খোলার জন্যও রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই বেশ কিছু বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ চালু হবে বলে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। 'সেল্ফ ফিনান্সিং' কলেজের অনুকরণে এ রাজ্যেও বেশ কিছু কলেজে চালু হয়েছে 'সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স'। তার মাসিক বেতন অনেক বেশি। যেমন — গড়িয়া এণ্ড্রুজ কলেজে মাইক্রোবায়োলজি অনার্সের মাসিক বেতন প্রায় আড়াই হাজার টাকা, আশুতোষ কলেজে কম্পিউটার সায়েন্সে মাসিক বেতন দু'হাজার টাকারও বেশি। অথচ এত টাকা খরচ করে যারা শিক্ষা নামক পণ্যটিকে কিনবে তাদের জন্য নেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো। যেমন — ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নেই উপযুক্ত ল্যাবরেটরি বা ওয়ার্কশপ, কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্সের জন্য নেই উপযুক্ত সংখ্যক কম্পিউটার।

এইভাবে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়াটি আজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। অথচ শিক্ষা কি পণ্য? শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? যুগ যুগ ধরে সমগ্র সমাজের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে যে জ্ঞানভাণ্ডার তাকেই কি আমরা শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করি না? শিক্ষা তাই সমগ্র সমাজের সম্পদ। কোন ব্যক্তি মালিক কি সেই সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করতে পারে? ইতিহাসের গতিপথে যাঁরাই দেশে দেশে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁরা সকলেই আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন শিক্ষার আলো। কিন্তু শিক্ষা যদি পণ্য হয়, তাকে যদি অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়, তাহলে সকলের কাছে সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। আর যারা বিপুল অংকের টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনবে, সেই ছাত্ররা কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুভব করবে না, সামাজিক মূল্যবোধও তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে না। রেনেসাঁর চিন্তানায়করা তাই অবৈতনিক শিক্ষার দাবি তুলেছিলেন। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরাধীন দেশে ব্রিটিশ শাসকরা যখন চেয়েছে এদেশের ছেলেমেয়েরা অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাক, তখন এদেশের মনীষীরা দোরে দোরে ভিক্ষা করে স্কুল-কলেজ গড়ে তুলেছিলেন। আর স্বপ্ন দেখেছিলেন এদেশ যখন স্বাধীন হবে তখন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত ছেলেমেয়ের কাছে সমানভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে যাবে। তাই লালা

চারের পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে তুলাচাষিদের জীবনজীবিকা বিপর্যস্ত

তুলাচাষি বালকৃষ্ণ সাওয়াই-এর মৃতদেহ শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর নিজেরই চাষের খেতে গত ৩০ অক্টোবর। পূর্ব মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের হিঙগংঘট জেলার জাগোনা গ্রামের চাষি সাওয়াই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পেছনে পড়ে রয়েছে তাঁর অসহায় পরিজন আর ৫০ হাজার টাকা দেনার বোঝা। একা বালকৃষ্ণ নয়, গত দেড় বছরে শুধু মহারাষ্ট্রের ১২টি জেলা থেকেই ৮০ জন তুলাচাষির আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তীব্র আর্থিক সঙ্কট আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে চাষিদের। অবশ্য মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী ও তাঁর আমলারা একথা মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণেই নাকি এই গণআত্মহত্যা।

এর আগে ১৯৯৭ সালে অসময়ে বৃষ্টির দরুণ আরো একবার মহারাষ্ট্রের তুলাচাষিরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেবারও তাঁদের অনেককে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছিল। এবারেও দু'বছর ধরে খরার প্রকোপ চলেছে রাজ্যে। কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা নয়, বিশেষজ্ঞদের মতে, তুলাচাষিদের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য সবচেয়ে বেশি মাত্রায় দায়ী ভারত সরকার অনুসৃত খোলাবাজার নীতি।

'গ্যাট' চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর '৯০-এর দশকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে যখন রপ্তানির ওপর থেকে বিধিনিষেধ উঠে গেল, সেইসময় বিশ্ববাজারে তুলার দাম ছিল বেশ চড়া। স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থায় কাপড়কল মালিকদের কাছে তুলা আমদানির চেয়ে দেশের বাজারে কেনা লাভজনক। ফলে তুলা বিক্রি হবে বেশি এই আশায় বহু চাষি সে সময় তুলা চাষের দিকে ঝুঁকেছিল। আজ মহারাষ্ট্রে তুলা উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি। কিন্তু কয়েক বছর পর থেকেই বিশ্ববাজারে তুলার দাম পড়তে শুরু করায় চাষিরা বিপদের সম্মুখীন হয়। অবশেষে ২০০১ সালে এই দাম ভীষণভাবে নেমে যায়। নানা কারণে তুলা চাষ এমনিতেই বেশ খরচসাপেক্ষ; তার ওপরে বাজারে তুলার দাম পড়ে যাওয়ায় চাষিরা প্রবল আর্থিক সঙ্কটের কবলে পড়ে, বেড়ে যায় তাদের ঋণের পরিমাণ। এর সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা যুক্ত হয়ে এই মরশুমে তুলা চাষিদের ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে।

শুধু বিশ্ববাজারে নয়, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে তুলা বিক্রি করতে গিয়েও এই দরিদ্র ক্ষুদ্র চাষিরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। খোলাবাজারেও নিয়ম অনুযায়ী ভারত সরকার এখন বিদেশি তুলার উপর আমদানি শুল্ক করে দিয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। তদুপরি আমেরিকা ও অন্যান্য তুলা রপ্তানিকারক দেশে তুলার বিশাল কারবারিরা বিপুল হারে সরকারি ভরতুকি ভোগ করে। ফলে তুলনামূলকভাবে কম দামে আমেরিকা থেকে ঢালাও তুলা আমদানি হচ্ছে ভারতের বাজারে। '৯৯ সালে আমেরিকা থেকে যে পরিমাণ তুলা আমদানি করা হতো, ২০০০ সালে তার পরিমাণ বেড়ে গেছে দ্বিগুণের বেশি। ফলে দেশের বাজারে এখন সস্তা তুলার অঢেল যোগান। কাপড়কলের মালিকরা এখন বাজার থেকে সস্তায় তুলা কিনে বিপুল হারে লাভ করছে, কিন্তু চাষের খরচ উঠিয়ে দেনা শুধতে না পেরে মরতে হচ্ছে অসংখ্য চাষিকে।

এই মৃত্যু মিছিল অনিবার্য নয়। আন্তরিকভাবে চাইলে এই মুহূর্তে সরকার তা রুখে দিতে পারে। যা প্রয়োজন, তা হল তুলার আমদানি শুল্ক কিছুটা বৃদ্ধি করা। এমনকি ডব্লু টি ও'র চুক্তি অনুযায়ী সরকারের তা করতে বিশেষ বাধাও নেই। চুক্তিতে ভারত সরকারকে ১০০% থেকে ৩০০% আমদানি শুল্ক বসানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। তুলার আমদানি শুল্ক কিছুটা বৃদ্ধি করা হলে আভ্যন্তরীণ বাজারে তুলার দাম বাড়তে পারে এবং তাহলে চাষিকেও এভাবে সর্বস্বান্ত হতে হয়না। তবুও সরকার সেটা করছে না কাপড়কল মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থেই। এই মালিকদের প্রভাব এতটাই যে, সরকার কিছুতেই তুলার উপর আমদানি শুল্ক বাড়াতে রাজি নয়। এই ঘটনায় একথাও স্পষ্ট হয় যে, তুলা চাষিদের দুর্দশার জন্য দায়ী কেবল বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থরক্ষাকারী ডব্লু টি ও'ই নয়। এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের সরকারও সমান দায়ী।

তুলা চাষিদের দুর্দশার শেষ এখানেই নয়। গত তিন দশক ধরে মহারাষ্ট্র সরকার 'এম সি পি এস' নামক যে বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে একটা বিশেষ দামে তুলা কিনে আসছিল, এ'বছর সেটা তো বন্ধই, তার ওপর গত বছর কেনা তুলার দামও সরকার চাষিদের এখনও দেয়নি। ফলে ফড়েদের দেওয়া দামেই তুলো বেচতে বাধ্য হয়ে মহাজনের ঋণের ফাঁদে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরছে চাষিরা।

মরতে হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের তুলা চাষিদেরও। মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে চিরাচরিত বীজের বদলে বি টি বীজ চাষ করেছিল তারা। ফসল মার খেয়েছে সাংঘাতিকভাবে। মরেছে দাহিগোয়ান গ্রামের বান্দু কাটকার — বৃদ্ধ বাবা-মা, অসহায় রুগ্ন স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের ওপর ১ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা চাপিয়ে। মারা গেছে অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুর জেলার এক চাষি মা, নিজের শিশুকন্যাটিকে খাওয়াবার জন্য একমুঠো ভাতের সন্ধানে বেরিয়ে চাল জোগাড় করতে না পেরে বিষ খেয়ে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছে সে।

এমন ঘটনা কেবল অন্য রাজ্যে ঘটছে, একথা ভাবার দিন শেষ। পশ্চিমবঙ্গে আলু চাষির করুণ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সদ্য প্রাণ দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের এক সবজি চাষি। সি পি এম সরকারও যে কৃষিনীতি নিয়েছে, তাতে চাষির সর্বনাশ অনিবার্য।

শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ও বেসরকারীকরণ বাতিল, গরিব কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, তথাকথিত পারস্পরিক ভরতুকি তুলে দিয়ে ধনীদের ভরতুকি দেওয়া বন্ধ করা, প্রতিটি গ্রাহককে মিটার দেওয়া এবং লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ বন্ধ করার দাবিতে গত ৩০ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড - সেবক রোড সংযোগস্থলে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির ডাকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ অবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক মৃণালকান্তি ঘোষ, জগদীশ দত্ত, শিবনাথ প্রসাদ, মনোরঞ্জন সাহা প্রমুখ।

কমিটির পক্ষ থেকে আগামী ২০ জানুয়ারি কলকাতায় গণআইন অমান্য এবং ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার আবেদন জানানো হয়।

শিক্ষার দরজা খোলা রাখতেও আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে

তিনের পাতার পর

লাজপৎ রাই বলেছিলেন, 'শিক্ষাই হচ্ছে জাতির প্রথম প্রয়োজন এবং যাবতীয় রাজস্বের সিংহভাগই এই খাতে ব্যয়িত হওয়া উচিত।'

স্বাধীনতাকামী মানুষের এই স্বপ্ন স্বাধীন দেশে কোনওদিন বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এদেশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে আসীন দলগুলি সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোনদিনই কোন সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। কারণ, লক্ষ-কোটি মানুষের সংগ্রামের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এল তার সাফল্যকে আত্মসাৎ করে এদেশে ক্ষমতায় বসেছিল পুঁজিপতিশ্রেণী। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তারের পরিবর্তে শিক্ষা সংকোচন। সেই কথাটাই বেরিয়ে এসেছিল ইউ জি সি-র প্রথম চেয়ারম্যান সি ডি দেশমুখের মুখ থেকে। তিনি বলেছিলেন, 'We want to restrict higher education in order to minimise the number of educated unemployed.' (শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমানোর জন্য আমরা উচ্চশিক্ষা সংকুচিত করতে চাই।') শিক্ষিত, সচেতন যুবকদের সরকার ভয় পায়। কারণ তারা প্রশ্ন করবে, জানতে চাইবে, সংগঠিত হবে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণীর আর একটি প্রয়োজন। চূড়ান্ত বাজার সংকটের মুখে পড়ে আজ পুঁজিপতিশ্রেণী চাইছে ব্যবসার এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে তুলনামূলকভাবে বাজারের সুযোগ থাকবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য হল এমন ক্ষেত্র। যে কোনও মানুষ না খেতে পেলেও অসুস্থ নিকট আত্মীয়কে চিকিৎসা করানোর শেষ চেষ্টা করে। ঘটি বাটি বিক্রি করে হলেও পিতামাতা সন্তানকে শিক্ষিত করতে চায়। ফলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করলে তার একটা নিশ্চিত বাজার আছে যেখান থেকে মালিকরা মুনাফা করতে পারবে। পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রয়োজনেই শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ।

অতীতে কংগ্রেসের মতো পরবর্তীকালে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারই শাসকশ্রেণীর স্বার্থে এই নীতি নিয়েই চলেছে। বর্তমানে বি জে পি-তৃণমূল জোট সরকার তাকে সর্বব্যাপক রূপ দিচ্ছে। এমনকি যে সি পি এম বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে সেই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারও শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য ব্যবসায়ীদের ঢালাও ছাড়পত্র দিচ্ছে এবং নিজেরা বিপুল হারে ফি বাড়াচ্ছে। তাদের ছাত্রসংগঠন এস এফ আই ফি-বৃদ্ধির পক্ষে জনমত গঠন করাকেই মহান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যেখানেই আন্দোলন গড়ে উঠছে তাকে ভাঙার ভূমিকা নিয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষার দাবিতে এস ইউ সি আই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ডি এস ও শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছে, বহু স্কুল কলেজে ফি-বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। আন্দোলন গড়ে উঠেছে জেলা ও রাজ্যস্তরেও। সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্র বিক্ষোভ মিছিলে উত্তাল হয়েছে পশ্চিমবাংলা। এই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ধারাতেই আগামী ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধের ডাক এসেছে। গরিব-মধ্যবিত্তের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে রাখতে এই আন্দোলন বন্‌ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে সাধারণ মানুষকে।

দেশে দেশে গণবিক্ষোভ, গণআন্দোলন

এফ টিএ এ-র বিরুদ্ধে মন্ট্রিল ও কুইটোতে বিক্ষোভ

ফ্রি ট্রেড এরিয়া অফ আমেরিকা (FTAA) হচ্ছে নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এরিয়া (NAFTA)-র মতই দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিকে লুঠ করে, তাদের সম্পদকে কুক্ষিগত করার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের একটি হাতিয়ার। নাফটার সৌজন্যে মধ্য আমেরিকার একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসাবে পরিচিত মেক্সিকো এখন সঙ্কট জর্জরিত দেশগুলির তালিকাভুক্ত। এ অভিজ্ঞতা থেকে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ আজ বুঝে গেছে যে FTAA-ও তাদেরকে এ পথেই টেনে নামাবে। তাই FTAA-র বিরুদ্ধে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে প্রতিরোধ লড়াই শুরু হয়ে গেছে, এ প্রসঙ্গে গত বছর কুইবেক (কানাডা) শহরে FTAA-র বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কানাডীয় ছাত্র ও পুলিশের ব্যারিকেড যুদ্ধের ঘটনা স্মরণযোগ্য।

কানাডার মন্ট্রিল শহরে FTAA-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে কানাডিয়ান ফেডারেশন অফ্ স্টুডেন্টস্-এর ডাকে ২০ হাজার ছাত্র পথে নামে। ৭ নভেম্বর বিক্ষোভকারীরা মিছিল সহযোগে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

গত ১২ নভেম্বর ইকুয়েডরের রাজধানী শহর কুইটোতে ৪০ হাজার মানুষ FTAA-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে শহরে মোতায়েন পুলিশ ও সেনারা কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে, ব্যাটন চালিয়েছে, অবশেষে গুলি চালিয়েছে। তিনজন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে। ইকুয়েডরের অত্যাচারী শাসকশ্রেণী নিপীড়ন চালিয়েও সাধারণ মানুষকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। গুলি চালানোর প্রতিবাদে পরদিন ইকুয়েডর জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। (সূত্র ঃ প্রলেটারিয়ান নিউজ, (ইন্টারনেট) ২২.১১.০২)

চিলিতে ধর্মঘটে হাসপাতাল অচল

গত ২০ নভেম্বর কয়েক হাজার ডাক্তার, হাসপাতাল কর্মী এবং সরকারি কর্মচারী চিলি সরকারের স্বাস্থ্য সংস্কার কর্মসূচির প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করলে রাজধানী সান্তিয়াগো সহ চিলির সব কয়টি বড় বড় শহরে হাসপাতাল পরিষেবা অচল হয়ে যায়। চিলি সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারের নাম করে বিভিন্ন রোগীদের হাসপাতালের অবৈতনিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে, তার প্রতিবাদেই এ ধর্মঘট। উল্লেখ্য, চিলির প্রেসিডেন্ট রিকার্ডো লাগোস ক্ষমতায় আসার পর এটাই হল সে দেশের বৃহত্তম ধর্মঘট।

এই ধর্মঘটের উদ্যোক্তা সে দেশের বৃহত্তম কর্মী সংগঠন 'মিউনিসিপ্যাল হেলথ ওয়ার্কার্স কনফেডারেশন'। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাদের সংগঠনের ৯০ হাজার সদস্য ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইউনিয়নের নেতা মাতুরানা বলেন, "আমরা চাই না কোনো শিশু বা অন্য কেউ হাসপাতালের অবৈতনিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হোক।" অপর এক নেতা মার্টিনেজ বলেন, "এ দাবিগুলির সমর্থনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট না ডাকা পর্যন্ত আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাবো।" তিনি আরও বলেন, "যখন সরকার ও বৃহৎ ব্যবসায়ীরা হাতে হাত মিলিয়ে জনসাধারণের অধিকারগুলি কেড়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছে, তখন একমাত্র শ্রমিকরাই জন-সাধারণের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে পথে নেমেছে।"

ধর্মঘটীদের সমর্থনে হাজার হাজার মানুষ চিলির রাজধানী শহর সহ দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরগুলিতে পথে নামেন। রাজধানী সান্তিয়াগো-তে বিক্ষোভকারীদের হঠাতে রায়ট পুলিশ জলকামান ব্যবহার করেছে এবং বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করেছে।

ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধর্মঘটের পাশাপাশি শিক্ষক ও বিচার- ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা ৬.৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে নেমেছেন। কর্তৃপক্ষ ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে।

২৭ নভেম্বর হাজার হাজার ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ডাক ও তার বিভাগের ছাঁটাই কর্মীরা সরকারের শ্রমনীতি ও স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান। (সূত্র ঃ প্রলেটারিয়ান নিউজ, ২৮ নভেম্বর ২০০২)

নেপলস শহরে পরিবহন কর্মচারীদের ধর্মঘট

১৭ ডিসেম্বর ইতালির নেপলস শহরের পরিবহন কর্মচারীরা মাসিক ১০৬ ইউরো তথা ১০৮ মার্কিন ডলার বেতন এবং সাপ্তাহিক ৩৮ ঘণ্টা কাজের সময়ের দাবিতে ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘট পালন করে। (সূত্র ঃ এ এফ পি, ১৮.১২.২০০২)

দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

মধ্য ইতালির পিসা ও ফ্লোরেন্সের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ক্যাম্প ডারবির সামনে ১৪ ডিসেম্বর প্রায় ৩০ হাজার মানুষ ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই বিক্ষোভের উদ্যোক্তা কোবাস লেবার ইউনিয়ন নামে একটি স্থানীয় শ্রমিক সংগঠন। (সূত্র ঃ এপি ১৫.১২.২০০২)

১৪ ডিসেম্বর মধ্য জার্মানীর ফ্রাঙ্ক-ফুর্ট শহরের কাছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রাইন মাইন-এর সামনে শতাধিক মানুষ ইরাকে আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। (সূত্র ঃ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১৫.১২.২০০২)

১৪ ডিসেম্বর প্যারিস সহ ফ্রান্সের কয়েকটি বড় বড় শহরে হাজার হাজার মানুষ মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিবাদে মিছিল করেছে। প্যারিস শহরের মিছিলের অগ্রভাগে একটি বিশাল ব্যানারে লেখা ছিল, 'যুদ্ধ নয়, সাম্রাজ্যবাদ নয়, অন্য একটা পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।" (সূত্র ঃ দি ডেকান হেরাল্ড, ১৬.১২.২০০২)

২৯ ডিসেম্বর ঃ *তুরস্কের* ইস্তাম্বুলে যুদ্ধবিরোধী মিছিল

নিউ ইয়র্কে ছাত্র বিক্ষোভ

২০ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক শহরে মার্কিন প্রশাসনের ইরাকনীতির বিরোধিতা করে বিশাল ছাত্র-বিক্ষোভ হয়। এই মিছিলে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। (সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান, ২১.১১.২০০২)

দক্ষিণ কোরিয়া উত্তাল

দক্ষিণ কোরিয়াতে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের দেশে ফিরিয়ে নেবার দাবিতে কয়েক হাজার মানুষ ২৩ নভেম্বর রাজধানী সিওলে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। গত জুন মাসে দুইজন ছাত্রীকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার দায়ে অভিযুক্ত দুই মার্কিন সেনাকে দক্ষিণ কোরিয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেবার দাবিও জানিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।

একই ইস্যুতে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী দক্ষিণ কোরিয়ায় অন্যতম মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ক্যাম্প বে-র সামনে গত ২৪ নভেম্বর বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা ঘাঁটির ভেতর হাতবোমা ছুঁড়ে দিয়েছে এ অভিযোগ তুলে রায়ট পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে এলে রায়ট পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। (সূত্র ঃ এপি ২৬.১১.২০০২)

সিওল

২৫ ডিসেম্বর হাজার হাজার মানুষ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে মার্কিন বিরোধী সমাবেশ করেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ হুমকির প্রতিবাদ জানাতে তারা মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে মিছিল করে। মিছিলকারীদের আটকানোর জন্য রায়ট পুলিশ তারের বেড়া দিয়ে মার্কিন দূতাবাসকে ঘিরে রেখেছিল।

মার্সাই

২৬ ডিসেম্বর মার্কিন নৌবাহিনীর বিমানবাহী জাহাজ ইউ. এস. এস. টুম্যান মার্সাই বন্দরে নোঙ্গর করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কয়েক হাজার মানুষ মার্সাই শহরে বিক্ষোভ মিছিল বার করে। মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছে, "ইয়াংকিরা ফিরে যাও।" (সূত্র ঃ প্রলেটারিয়ান নিউজ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০২)

তুরস্কে মিছিল

গত ১ ডিসেম্বর তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে প্রায় ২০ হাজার মানুষ ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিবাদ জানাতে মিছিল করেছে। উল্লেখ্য, তুরস্ক হচ্ছে ন্যাটো জোটের সদস্য এবং ১৯৯৯ সালে আমেরিকার ইরাক অভিযানে আমেরিকার সহযোগী ছিল। আমেরিকার এই নতুন পর্যায়ের যুদ্ধে তুরস্কের জনগণ তাদের দেশকে পুনরায় শরিক হতে দিতে রাজি নয়। ১ ডিসেম্বরের মিছিল থেকে শ্লোগান উঠেছে, "আমরা আমেরিকার ভাড়াটে সেনা হতে চাইনা", 'আমেরিকা ইরাক থেকে হাত ওঠাও", "আমরা ইরাকি জনগণের পক্ষে।" (সূত্র ঃ এপি ৩ ডিসেম্বর ২০০২)

'ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে দেহব্যবসা ভালো চলেছে'

সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ডেনমার্কে। সম্মেলনে ১০টি পূর্বতন কমিউনিস্ট দেশের অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে আর একটি সম্মেলন বহির্ভূত চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে স্থানীয় একটি ট্যাবলয়েডে। শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন দেহব্যবসা খুব ভালো চলেছে বলে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে একজন যৌনকর্মী।

এই সম্মেলনে কোন সাধারণ শ্রেণীর মানুষ নয়, রাষ্ট্রগুলির বড় বড় নেতা, মন্ত্রী, সরকারি আমলারা যোগ দিয়েছিল। এই ছোট্ট সংবাদটিতে এদের নগ্ন অবক্ষয়ী চেহারাটি প্রকাশ হয়ে যায়। রাষ্ট্রের কর্ণধারেরাই যেখানে আকণ্ঠ পঙ্কে নিমজ্জিত সেখানে সমাজের তথাকথিত মাথা হিসাবে তারা সমাজকে আরও অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যাবে না কি ? তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই যে সমাজে এই সব নিষিদ্ধ নোংরা ব্যবসা অবাধে চলবে সেটাই তো স্বাভাবিক। বাস্তবে আজ আমরা সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে এ জিনিসটিই দেখতে পাচ্ছি।

(সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১৮-১২-২০০২)

উত্তরপ্রদেশে

আখচাষিরা ফসলের দাম পাচ্ছে না

উত্তরপ্রদেশে আখচাষি এবং চিনিকল শ্রমিকদের জীবন সংকটে জর্জরিত। বিগত কয়েক মাস ধরে এ-রাজ্যের প্রায় সমস্ত চিনিকল বন্ধ, চিনিকল মালিকদের কাছে আখচাষিদের পাওনা ৫ কোটি টাকা বাকি পড়ে আছে, এ বছর উৎপাদিত আখ বিক্রি হয়নি। সমস্যা জর্জরিত লক্ষ লক্ষ আখচাষি বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, প্রশাসন প্রায় অচল করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে "বস্তিতে" পুলিশ গুলি চালিয়ে একজন আন্দোলনকারী কৃষককে হত্যা করেছে। আন্দোলনের চাপে কিছু চিনিকল খুলেছে, কিছু চাষি আখ বিক্রিও শুরু করেছেন। কিন্তু মূল সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি।

ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতও বিশ্বের অন্যতম চিনি উৎপাদক দেশ। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র উত্তরপ্রদেশ সহ নানা রাজ্যেই আখ চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশের অন্যতম কৃষি উৎপাদন হল আখ। অথচ চিনির বাজার মন্দা। দেশিয় বাজার সঙ্কুচিত। বছর দশেক আগেও চিনিকল থেকে ৩৫ শতাংশ চিনি লেভি হিসাবে সরকার কিনত এবং রেশনের মাধ্যমে বিক্রি করত, বর্তমানে তা বন্ধ। বিদেশের বাজারেও বিক্রেতা অনেক। এই অবস্থায় সংস্কার নীতির প্রচারকরা বলছে জিনপ্রযুক্তিতে তৈরি রপ্তানিযোগ্য গুণমানের আখ উৎপাদন এদেশে হচ্ছে না বলেই সঙ্কট। কাজেই ওই ধরনের বীজ চালু করতে হবে। কিন্তু তাহলেই কি রপ্তানি বাজার খুলে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর নেই। এদেশে রপ্তানি মানের যেসব কৃষি পণ্য তৈরি হয় তার বাজার কি অবাধ? আসলে বিশ্ববাজার পুঁজিবাদী সঙ্কটে জর্জরিত যার প্রভাব পড়ছে চিনির উপর।

উৎপাদন অনুপাতে দেশে বাজার নেই। তার ওপর দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ শক্তি হিসাবে ভারতীয় পুঁজিবাদ তার আধিপত্যবাদী বিদেশনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবেশী পাকিস্তান থেকে চিনি আমদানি করছে। বিক্রি করছেন নওয়াজ শরিফ, কিনছেন বাজপেয়িজির জামাতা — লাভ করছে দুপক্ষই। মরছে চাষি, মরছে চিনিকল শ্রমিক। চিলিকলগুলি থেকেও মালিকরা লাভই করেছে বছরের পর বছর, কারখানার উন্নয়ন ঘটায়নি। ফলে সঙ্কট ক্রমে তীব্র হয়েছে।

চিনি কলগুলির মালিকানা তিনরকম; পুরো সরকারি, আধা সরকারি এবং বেসরকারি। সরকারি সাহায্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে। মিল মালিকরা সঙ্কটের ধুয়ো তুলে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়েও কম দামে আখ কিনছে। মিল মালিকরা দাম না দেওয়ায় চাষি বিপদে পড়ছে। একের পর এক মিল বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকরাও কাজ হারাচ্ছে। এই অবস্থায় উত্তরপ্রদেশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কেউই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। আখচাষি ও চিনিকল শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কর্মসূচি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে বহরমপুরে আলোচনাসভা

সারা বাংলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পক্ষ থেকে গত ২৭ ডিসেম্বর বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে মাঙ্গলিক সঙ্গীতগোষ্ঠী। কমিটির যুগ্ম-সম্পাদিকা খাদিজা বানু অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া কমিটির অন্যতম সম্পাদক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনিল কুমার দাঁ বক্তব্য রাখেন। জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বপন ঘোষাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ দেশে বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা ও মানুষের ঐক্য ভাঙার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে চাই লাগাতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রভাত রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সনৎ কর প্রমুখ। কমিটির রাজ্য সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক তরুণ সান্যালের পাঠানো বার্তাটি সভায় পাঠ করে শোনানো হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দেবী ঠাকুর। কবিতা আবৃত্তি করেন চন্দন দাশগুপ্ত, শিবেশ মুখার্জী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহুয়া চক্রবর্তী, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, কুমুদ মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়া কৌশিক চ্যাটার্জী রচিত 'ঐকতান' গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয় এবং রূপশিল্পীর নাটক 'লৌকিক' পরিবেশিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী।

জলকর রুখতে সংগঠিত আন্দোলন চাই

একের পাতার পর

— জলকর দিতেই হবে। মেয়র এও বলেছেন যে, জলকর নতুন করে বসানো হচ্ছে — তা নয়, ইতিমধ্যেই এই কর হোটেল, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উপর আছে। এখন সাধারণ গৃহস্থদেরও এই করের আওতায় আনা হচ্ছে। ভাবখানা যেন, যে কর ইতিমধ্যেই চালু আছে তার আর প্রতিবাদ করার কি আছে? ১৯৮৫ সালে যখন জলকর চালু করার প্রস্তাব ওঠে আমাদের দল তখনই স্পষ্টভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেছিল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশেই সি পি এম জলকর বসাচ্ছে এবং আজ না হলে কাল এই কর সকলের উপরেই বসবে। বর্তমানে তৃণমূলকে দোসর করে সি পি এম সেই কাজটাই করছে।

পুরমন্ত্রী এবং মেয়র এক সুরে বলেছেন — টাকা নেই। সরকারের টাকা নেই, পুরসভারও টাকা নেই। অতএব বিনামূল্যে পানীয় জল দেওয়ার ন্যূনতম দায়িত্ব তাঁরা নেবেন না। মন্ত্রীদের জন্য নিত্যনূতন গাড়ি কিনতে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি এবং তেল যোগাতে লক্ষ লক্ষ টাকা যাঁরা খরচ করে, ফিল্ম উৎসবের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করে পরে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ যারা করতে পারে, দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা যারা পকেটস্থ করে, সেই সরকার পানীয় জলের মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবার জন্য টাকা দিতে পারবে না কেন? যে পুরসভা ধনীদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রাপ্য কর অনাদায়ী ফেলে রেখেছে, যে পুরসভার দুর্নীতি গল্পকথার মতো, তারা বকেয়া কর আদায় বা দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা না করে গরিব ও মধ্যবিত্তের ওপর বিপুল করের বোঝা চাপাচ্ছে কেন? কারণ এরা ধনী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থের রক্ষক, গরিব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থের বিরোধী। রাস্তা নির্মাণ থেকে নর্দমা সাফাই হাজারো কাজের জন্য এরা কোটি কোটি টাকা বিশ্বব্যাঙ্ক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে যার বেশিরভাগ গিয়েছে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার-প্রমোটারদের পকেটে। এখন সেই ঋণের শর্ত এবং গরিবের ঘাড় ভাঙার সরকারি নীতির ফলে চাপান হচ্ছে জলকরের বোঝা।

জলকরের পরিমাণও বিশাল। কলকাতা পুরসভা এলাকায় নিম্নবিত্ত মানুষের ছোট বসতবাড়ির সম্পদ কর যেখানে বছরে চল্লিশ থেকে দু-আড়াইশো টাকা সেখানে জলকর হবে মাসিক ৩০ টাকা, বার্ষিক ৩৬০ টাকা, অর্থাৎ সম্পদ করের চেয়েও বেশি। অথচ উপর দিকে জলকর মাসিক সর্বোচ্চ ১২০ টাকায় বেঁধে দেওয়ায় কয়েক শো গুণ বেশি সম্পদের অধিকারীকে চারগুণের বেশি কর দিতে হবে না। অর্থাৎ সম্পদ করের সমানুপাতে জলকর বসানো হচ্ছে না, ধনীদের তুলনামূলকভাবে রেহাই দিয়ে গরিব ও নিম্নবিত্তের উপর অধিক হারে কর তারা চাপাচ্ছে। এমনকি বস্তিবাসী মানুষ, যাদের রোজগারের ও প্রতিদিন খাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই, রাস্তার কলে জল নেন বলে তাঁদেরও মাসে পাঁচ টাকা করে কর দিতে হবে। এরপরও লজ্জার মাথা খেয়ে পুরমন্ত্রী বলেছেন — গরিবদের উপর তাঁরা নাকি জলকর বসাচ্ছেন না। যে পর্যন্ত তাঁরা জলকর নিচ্ছেন তারপর বাকি থাকে ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও ফুটপাথবাসীরা, যাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ফন্দি এখনও তাঁদের জানা নেই।

শুধু পানীয় জলের উপরেই নয়, সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রেই সরকার চার্জ বাড়াচ্ছে। কংগ্রেস প্রবর্তিত, বিজেপি অনুসৃত বিশ্বায়নের পরিপূরক নয়া আর্থিক নীতিই সি পি এম অনুসরণ করছে এবং সেই নীতি অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্ব থেকে সরে এসে পরিষেবার ব্যবসায়ীকরণ ও বেসরকারীকরণ করছে। এজন্য বামপন্থার কোন তোয়াক্কা না করে তারা জনগণের ঘাড়ে কর-দর বৃদ্ধির বিপুল বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। জলকর এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ সংযোজন।

এইভাবে দারিদ্র ও সংকট জর্জরিত মানুষের ঘাড়ে বিপুল করের বোঝা, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল স্কুল-কলেজের বাড়তি মাশুল, চার্জ ও ফি তারা চাপাতে পারছে কেন? দেশের মধ্যে প্রকৃত গণআন্দোলন নেই বলেই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এই বিশাল বোঝা চাপাতে সাহস পাচ্ছে। সংসদীয় দলগুলি গদির স্বার্থে সীমিত বিরোধিতার বাইরে এখন আর যেতে রাজি নয়। কারণ ভরতুকি তুলে দেওয়া এবং কর-দর বৃদ্ধির প্রশ্নে সি পি এম, তৃণমূল, কংগ্রেস বিজেপি সকলেই একমত। এরা যে যেখানে ক্ষমতায় বসে আছে সেখানেই কর-দর বাড়াচ্ছে, যেখানে বিরোধী পক্ষে সেখানে গদি দখলের স্বার্থে লড়াইয়ের ভাণ করছে। কিন্তু সরকারকে জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারে বাধ্য করার মতো করে আন্দোলন তারা গড়ে তুলছে না। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ জমছে, তারা সরকারি দলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। সংসদীয় বিরোধীদের আন্দোলন-আন্দোলন খেলা এবং গরম বুকনির আড়ালে আন্দোলনের সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেওয়ার চক্রান্তও তারা ধরে ফেলছে। কিন্তু এও বুঝতে হবে যেমন তেমন করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেই, কোনভাবে একটা 'আন্দোলন' করলেই সরকারকে চরম জনবিরোধী কর-দর বৃদ্ধির নীতি প্রত্যাহারে বাধ্য করা যাবে না। এজন্য চাই সচেতন, সংঘবদ্ধ, লাগাতার আন্দোলন, যেমন আন্দোলন একমাত্র এস ইউ সি আই দল গড়ে তুলছে। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে যখন

আটের পাতায় দেখুন

এডিবি'র ঋণ নিয়ে সি পি এম-এর দ্বিচারিতা

পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম যে জলকর বসাচ্ছে তার পিছনে অন্যতম কারণ হল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের (এডিবি) শর্ত। আবার কেরালায় এ কে অ্যান্টনির নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার এডিবি থেকে ২০ কোটি ডলার ঋণ নেওয়ায় সি পি এর তার বিরোধিতা করছে। অথচ, এডিবি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কেরালায় পূর্বেকার সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের সময়। শ্রী নায়নারের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় বসে সি পি এম যে কাজ করছে, কেরালায় ক্ষমতায় নেই বলে সেই কাজের বিরোধিতা করতে তাদের আটকাচ্ছে না। সি পি এম নেতা অচ্যুতানন্দন এও বলে রেখেছেন যে ভবিষ্যতে তাঁরা ক্ষমতায় এলে এই ঋণের দায়িত্ব নেবেন না। দু রাজ্যে সি পি এমের এই বিপরীত আচরণ আসলে এক সূত্রে গাঁথা। তা হল গদি। গদিতে না থাকলে গদির জন্য লড়াই-এর সঙ্গে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই।

বিজেপি সরকার পাঠ্যবইয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করছে

ইতিহাসের বিকৃতিসাধনের অপপ্রয়াস দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে প্রবল বিতর্ক এবং আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে NCERT প্রণীত স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বই প্রকাশিত হওয়ার পর। গত ১২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের স্টে-অর্ডার তুলে নেওয়ার পর বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই ইতিহাস বই বিশেষ করে ষষ্ঠ ও দশম শ্রেণীর ইতিহাস বই-তে পূর্বপ্রণীত বই থেকে যেভাবে বহু তথ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে, নতুন কিছু তথ্যকে যেভাবে সংযোজিত করা হয়েছে তা নিছক ভুল নয়। বরং তা প্রায় বেনজিরভাবে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর অপচেষ্টা। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদরা প্রতিবাদ করেছেন। নানান রাজ্য সরকার এর বিরোধিতা করেছে এবং ইতিমধ্যে পাঞ্জাব সরকার সেই রাজ্যে NCERT প্রণীত ইতিহাস বই না পড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার NCERT-র অধিকর্তা হিসাবে সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ কর্মী জে এস রাজপুতকে নিয়োগ করে এবং NCERT 'আদর্শ পুস্তক' রচনার জন্য ইতিহাস পুনর্লিখনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, ইতিহাস রচনার প্রশ্নে আমাদের দেশে যথার্থ গণতান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বা আবেগমুক্ত মন নিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘটনা পরম্পরার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা তেমনভাবে এদেশে ঘটেনি। যদিও তার দ্বারা এটা যুক্তিসিদ্ধ হয় না যে, শুদ্ধিকরণের নামে সরকারি ক্ষমতাবলে সরকারি দলের মত অনুযায়ী ইতিহাস লেখা ন্যায়সঙ্গত। এই বিকৃতিই পরিলক্ষিত হয়েছে NCERT-র স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইতে।

এতদিন ইতিহাসকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে পড়ানো হত। বর্তমানে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও সিভিক্স সবগুলোকে যুক্ত করে একটা বিষয় করা হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে সমাজবিজ্ঞান। এককথায় এর দ্বারা ইতিহাস পাঠের গুরুত্বকেই লাঘব করা হয়েছে। তদুপরি সেই ইতিহাস বইতেই ঘটানো হয়েছে নানান বিকৃতি। সমাজবিজ্ঞানের যে বইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক তথা NCERT-র পরিকল্পনায় NCFSE প্রকাশ করেছে তার ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পুস্তকের দশম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, হরপ্পা ও বৈদিক সভ্যতা এক এবং অভিন্ন। সকলেই একথা জানেন যে, এই ধারণা বা তত্ত্বটি বিজেপি ও সংঘ পরিবারের তৈরি এবং কোনরকম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের তোয়াক্কা না করেই তারা এর প্রচার করে চলেছে। আশ্চর্যের বিষয়, হরপ্পা, সিন্ধু বা সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ব্যাখ্যা করার সময় বইটির কোথাও তারা উল্লেখ করেনি যে, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা পাকিস্তানে অবস্থিত। তাছাড়া এই সভ্যতার পতনের কারণটিও বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি কি পরিকল্পিত নয়? আসলে এই সভ্যতার পতনের কারণ বিবৃত করতে গেলেই অনিবার্যভাবে এসে পড়বে আর্য আগমনের প্রশ্ন — যা এলে আর্যরা এদেশেরই বাসিন্দা বলে বিজেপি যে প্রচার করে, তার অসারতা প্রমাণিত হয়ে পড়বে। তাই সেই অংশটি বাদ পড়ল ইতিহাস বই-এ। শুধু তাই নয়, হরপ্পা সভ্যতার সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নত বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে নিকাশী ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতাকে আর্য সভ্যতা থেকে পৃথক করেছিল তার যথাযথ গুরুত্ব এবং স্বীকৃতি না দিয়ে হাস্যকরভাবে তাকে NCERT দেখানোর চেষ্টা করেছে, হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের নিছক একটা ইচ্ছা বা ভালবাসা হিসাবে।

এই বইটির একাদশ অধ্যায়ে বৈদিক সভ্যতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৈদিক ভূগোল সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ঋক্‌বেদের সময়ে হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রে মানুষ একত্রে বসবাস করত এবং হরপ্পা সভ্যতার বেশির ভাগ বসতিই ছিল সরস্বতী নদীর তীরবর্তী। এখানেও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। 'হরপ্পা সভ্যতা সরস্বতী নদী কেন্দ্রিক এবং বৈদিক সভ্যতা ও হরপ্পা সভ্যতা এক ও অভিন্ন' — এই মতামত প্রচার করা এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল। এই দুই সভ্যতাকে এক ও অভিন্ন বলে দেখানোর তাগিদে বিজেপি ও সংঘ পরিবার মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। এ কি ইতিহাসের 'শুদ্ধিকরণ', নাকি ইতিহাসের বিকৃতি? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেহেতু ঋক্‌বেদে ঘোড়া ও রথের উপস্থিতি প্রকট, অথচ সিন্ধুসভ্যতায় তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই — তাই সিন্ধুসভ্যতার শীলমোহরে ঘোড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে বলে তুমুল আলোড়ন তুলে দিয়েছিলেন তাদের এক ঘনিষ্ঠ জনৈক রাজারাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, এতদিন যে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার কেউ করতে পারেন নি, তা তিনি পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এও বললেন, যে পদ্ধতিতে তিনি তা পেরেছেন আর কারুর পক্ষে সেটি পারা সম্ভব নয়, এবং একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তা পড়তেও পারবেন না। অর্থাৎ, তিনি যা বলবেন, সকলকেই তা মানতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়।

একইভাবে বৈদিক যুগের খাদ্যাভ্যাস নিয়েও ইতিহাস বইতে তারা সঠিক তথ্য দেয়নি। সকলেই জানেন, বিজেপি ও সংঘ পরিবার সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য থেকে গো-হত্যা নিবারণের দাবি তোলে, যার সঙ্গে পশুপ্রেম বা গো-ভক্তির কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের গো-ভক্তিকে সাম্প্রদায়িক চেহারা দিতেই মুসলমানদের নৃশংস গো-হত্যাকারী হিসাবে তারা দেখায়। বৈদিক যুগে পশুপালক আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই তাদের মূল অবলম্বন গরুকে সম্পদ ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত, এটি ঐতিহাসিক সত্য এবং বেদে এর উল্লেখ আছে। বিবেকানন্দও এর উল্লেখ করেছেন, তাতে হিন্দুধর্ম রসাতলে যায়নি। কিন্তু একথা স্বীকার করলে হিন্দুত্ববাদ সমস্যায় পড়ে, কারণ গো-হত্যাকে হাতিয়ার করে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার জমিটা হারিয়ে যায়। তাই বৈদিক যুগের আর্যরা গোমাংস খেত এই সত্যটা তারা ইতিহাস বইতে রাখেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি অনুল্লেখিত রেখে তারা মুসলমানদের "গো-হত্যাকারী" বলে চিহ্নিত করার রাস্তাটি খুলে রাখতে চেয়েছে, যা ইতিহাসের উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি সাধন।

এই বইয়ের সপ্তদশ অধ্যায়ে একই কথার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হয়েছে এটি একটি সংঘাত বিহীন ধর্ম। অথচ ইতিহাস বলে ঠিক উল্টো। বৈদিক যুগ থেকেই ধর্মীয় সংঘাত বা নানান বিরোধিতার কথা অজানা নয়। হিন্দুধর্মেরই একাংশ আর্যসমাজ 'সনাতন ধর্ম'-চিন্তার বিরোধী। এছাড়া খৃষ্টধর্মের নানান মতপার্থক্যের উল্লেখ বইতে থাকলেও বৈদিক ধর্মীয় বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে বিরোধ বিদ্যমান ছিল তার কোনও উল্লেখ নেই। হিন্দুত্বকে একটা সংঘাতহীন সহিষ্ণু চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ নিছক ভুল নয়।

আরও আশ্চর্যের কথা হল, হিন্দুধর্মকে একটা অলীক গৌরব দেওয়ার জন্য, জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের এবং তাদের উত্থান এবং ভূমিকার উল্লেখই করা হয়নি। বরং উপনিষদের ছয়টি দর্শনের মধ্যে উল্লেখিত জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভের একটা পথ হিসাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে চিত্রিত করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে এই দুটি ধর্মই যে বেদের কর্তৃত্ব ও পশুবলির বিরোধিতা করে এবং যার ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে তাদের প্রবল সংঘাত ঘটে — তার উল্লেখ নেই। এই হচ্ছে 'সর্বধর্ম সমভাবের' নামে তাদের হিন্দুত্বের আগ্রাসী রূপ।

ষোড়শ অধ্যায়ে তালিবানদের দ্বারা বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের উগ্র ধর্মান্ধতার ঘটনার সবিশেষ উল্লেখকে সুদূর আফগানিস্তান থেকে টেনে আনা হয়েছে, অথচ এই দেশের মধ্যে অযোধ্যায় ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কথা নেই।

নবমশ্রেণীর ইতিহাস বই-এ নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের মতই সাম্যবাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লবকে দেখানো হয়েছে 'ক্যু' হিসাবে। উদ্দেশ্য, সমাজবিপ্লবের ভূমিকাকে নস্যাৎ করা। এই পুঁজিবাদী সমাজের বিপ্লবাত্মক রূপান্তর যে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং সোভিয়েত বিপ্লব যে তারই বাস্তব অনুপ্রেরণাময় ঘটনা, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই বিপ্লবকে দেখানো হয়েছে 'ক্যু' হিসাবে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু নয়, লক্ষ লক্ষ ইহুদির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক নাৎসিদের বীভৎসতার উল্লেখ নেই ইতিহাস বই-এ। তেমনি উল্লেখ নেই মানবসভ্যতার সেই ঘৃণ্যতম শত্রু পরাজিত হয়েছিল সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের দ্বারাই। এগুলি ইতিহাসের চরম বিকৃতি ছাড়া আর কি!

নবমশ্রেণীর বই-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় মাদাগাস্কার দ্বীপকে ভারত মহাসাগরের পরিবর্তে যে বলা হয়েছে আরব সাগরের দ্বীপ হিসাবে, তার উদ্দেশ্যই বা কি — এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইতিহাসবিদদের মধ্যে।

বইটির দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের সূচনাপর্ব থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির উল্লেখ থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে গান্ধী হত্যার উল্লেখ নেই। ইতিহাসের বই থেকে বাদ পড়েছে এই ঘটনা। তার একমাত্র কারণ হতে পারে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাই যে গান্ধী হত্যার জন্য দায়ী, এ সত্য যাতে ছাত্রছাত্রীরা জানতে না পারে। অথচ মুসলিম লিগ ও মুসলিম মৌলবাদের বহু বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে। বইতে এমনও বলা হয়েছে মুসলিম লিগ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সাম্প্রদায়িক দিকে নিয়ে গিয়েছে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে একমাত্র ভারতীয় কমিউনিস্ট এবং জিন্নার অনুগামীরা সমর্থন করেনি। বেদনার হলেও সত্য যে, কমিউনিস্ট নামধারী দল সি পি আই শুধু সেদিন ভারত ছাড়ো আন্দোলন সমর্থন করেনি তাই নয়, বরং কার্যক্ষেত্রে তার বিরোধিতাই করেছে এবং এই আচরণ কোনওমতেই কমিউনিস্টসুলভ ছিল না। সেই কারণে মহান সাম্যবাদী নেতা কমরেড স্ট্যালিন পরবর্তীকালে এর জন্য সমালোচনা করেছিলেন সি পি আই নেতৃত্বের। এতো একটা দিক। কিন্তু ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সি পি আই ছাড়া শুধুমাত্র মুসলিম লিগ সমর্থন করেনি — এটাই কি প্রকৃত ইতিহাস? একথা তো সত্য যে, হিন্দু মহাসভা, আর এস এস সহ উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাও এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। নিজ নিজ পদে আসীন থেকে বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন আর এস এস-এর ভি ডি সাভারকর। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও এই আন্দোলনকে 'বিশৃঙ্খলা' বলে নিন্দা করেছিলেন। বিজেপি জোট সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এই আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, যার ফলে তাঁর এক কাকা লীলাধর বাজপেয়ীর শাস্তি হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদীরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে তো স্বাধীনতা আন্দোলন বলেই মনে করতো না। অথচ ইতিহাস রচনার সময় সে সত্যকে তাঁরা বিকৃত করছেন। এরই সাথে আরও উল্লেখ্য যে, এই বইটির সপ্তম অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বহু আলোচনা থাকলেও উল্লেখ নেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসীনীতির। বর্তমান একমেরু বিশ্বের শ্লোগানের দ্বারা তাদের আগ্রাসননীতি বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবনকে যে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে সে ব্যাপারে নীরব থেকে তার পরিবর্তে ভারত

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২২ সংখ্যা

বিদ্যুৎমাশুল ঃ সরকার কি এতদিন ঘুমিয়ে ছিল ?

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুতের চার্জে পারস্পরিক ভরতুকি বজায় রাখার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ পেয়েও তা নিতে তিনবার ব্যর্থ হয়েছে। সি-ই-এস-সি'র বিদ্যুৎ মাশুলে পারস্পরিক ভরতুকি প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বর্তমানে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। সরকারের এই পরিকল্পনাকে বিশেষজ্ঞ মহল "বড় দেরিতে নেওয়া" "তুচ্ছ" সিদ্ধান্ত বলে বর্ণনা করছেন।

"বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট একটি রুলিং দিয়েছে। ফলে একমাত্র শীর্ষ আদালতই পারে এই বিষয়ে মীমাংসা করতে।" — বুধবার এখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একথা জানালেন।

ভরতুকি পাকাপাকিভাবে প্রত্যাহার করার আগে কমপক্ষে তিনবার সরকারের কাছে সুযোগ ছিল এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার। সি-ই-এস-সি'র মাশুল নির্ধারণে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গত মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন যখন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল, তখন রাজ্য সরকারের উচিত ছিল সেই কেসের অংশীদার হওয়া। "এটা উচিত ছিল কারণ হাইকোর্টের রায়ে রাজ্য সরকারের তৈরি করা কমিশনের অস্তিত্বই একটা প্রশ্নের মুখে পড়েছিল" — তিনি বলেন।

'সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি' যখন সুপ্রিম কোর্টের পারস্পরিক ভরতুকি প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রদত্ত ৩ অক্টোবরের রায়ের ব্যাখ্যা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল, তখনও রাজ্য সরকার পারত সেই মামলায় অংশ নিতে। "জনস্বার্থে সরকারের উচিত ছিল গ্রাহক সমিতির সাথে যোগ দেওয়া", কর্মকর্তাটি বলেন।

ঐ সরকারি কর্মকর্তা বলেছেন, যেহেতু বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির পিছনে এস ইউ সি আইয়ের সমর্থন আছে, তাই বামফ্রন্ট সরকার চায়নি ঐ মামলায় অংশ নিয়ে রাজনৈতিকভাবে কোন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে। যাই হোক, সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদনটি খারিজ করে দেওয়ার পরও একটি শেষ পথ খোলা আছে। তিনি জানালেন — "সরকার এখনও পারে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী কমিশনকে নির্দেশ দিতে।"

পরিস্থিতি বর্তমানে যেভাবে রয়েছে তাতে দ্রুত সমাধান হওয়ার কোন আশা নেই। "কোর্ট আবার জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে খুলবে। তখন কোর্টে কেস ফাইল করা হবে।" তিনি আরো বলেন, "এমনকি তারপরের কাজগুলোর জন্য অনেক সময় লাগবে। যে হাইকোর্টে হেরে যাবে সে সুপ্রিম কোর্টে যাবে। আরো পাঁচ-ছয় মাসের আগে বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম। সরকারি কর্তাদের মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে এ রাজ্যের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকেও নির্দোষ বলা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট, তার নির্দেশের কোথাও সুনির্দিষ্ট করে এক ধাক্কায় পারস্পরিক ভরতুকি পুরো প্রত্যাহারের কথা বলেনি। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সুপ্রিম কোর্টের সি-ই-এস-সি সংক্রান্ত মামলার রায় বেরোনোর পর ধাপে ধাপে পারস্পরিক ভরতুকি প্রত্যাহারের কথা বলেছে। "

(টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিবেদন, ৩১ ডিসেম্বর, '০২)

তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর জীবনাবসান

সুন্দরবন অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১ জানুয়ারি, ২০০৩ সকাল ১১টায় জয়নগরে দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর মৃত্যুসংবাদ জয়নগরে জেলা সদর কার্যালয়ে পৌঁছানোমাত্র রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। তাঁর মরদেহ জেলা অফিসে নিয়ে আসা হলে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান, রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড গোপাল বসু, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নলিনী প্রামাণিক, কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জয়নগর-মজিলপুর পৌর এলাকায় শোকমিছিলের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় নলগোড়া অফিসে। পথে বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে শত শত কর্মী-সমর্থক, দরদী তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের হাতে ছিল মালা, চোখে জল, মুখে স্লোগান — "কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী লাল সেলাম।" মরদেহ নিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে যখন ঘাটিহারানিয়াতে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। অন্ধকারের মধ্যেই শত শত কর্মী-সমর্থক মিছিল করে তাদের প্রিয় নেতার মরদেহ নিয়ে চললেন নলগোড়ায়। বয়স্কদের হয়ত মনে পড়েছে, অতীতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিভাবে তাঁদের নেতা কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী বলিষ্ঠভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন। তরুণদের চোখেও জল, মনে তাঁর অপূরিত স্বপ্নকে সফল করার প্রতিজ্ঞা। পরের দিন অগণিত কর্মী-সমর্থকদের মাল্যদান অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার প্রয়াত কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁর অপূরিত স্বপ্ন সফল করার জন্য কর্মীদের শপথ নিতে বলেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ও লাল সেলাম জানানোর মধ্য দিয়ে ব্যথিত-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীকে শেষ বিদায় জানান নলগোড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ। ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে স্মরণসভা।

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী লাল সেলাম

তীর্থযাত্রীদের উপরও বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপাল সরকার

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

"যেখানে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য বিনা খরচে নানা বন্দোবস্ত করা হয়, এমনকি প্রবল হিন্দুত্ববাদী কেন্দ্রের বি জে পি-সরকারও হজযাত্রীদের সুবিধা দিয়ে থাকে, সেখানে রাজ্যের সি পি আই (এম) সরকার গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যধিক পরিবহণ ভাড়া ও নানা আর্থিক বোঝা চাপিয়েছে। পানীয় জলের দাম চালু, কোর্ট ফি বাড়ানো — এ'রকম নানাভাবে প্রায় রোজই যেভাবে ট্যাক্স-সেস্ ও দাম বাড়ানো হচ্ছে এবং নতুন করে চালু হচ্ছে তাতে এটা পরিষ্কার যে রাজ্য সরকারের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোথায় কিভাবে জনগণের পকেট কেটে আয় বাড়ানো যায়। কিন্তু সরকার দেশি-বিদেশি বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসাদারদের ক্ষেত্রে খুবই দয়ালু।

আমরা তীর্থযাত্রীদের উপর বর্ধিত আর্থিক বোঝা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।"

জলকর রুখতে সংগঠিত আন্দোলন চাই

ছয়ের পাতার পর

জলকর চালু করার প্রস্তাব আসে তখনই আমরা এর প্রতিবাদ করেছি। সেই আন্দোলন আজও থেমে নেই। আগামী ২৭শে জানুয়ারি বন্‌ধের মধ্য দিয়ে আন্দোলন আরও দুর্বার হবে। জলকর সহ নতুন নতুন কর বসিয়ে, পুরনো করগুলি ক্রমাগত বাড়িয়ে কলকাতা ও মফঃস্বল শহরগুলিতে গরিব মধ্যবিত্তের বসবাস অসম্ভব করে তোলার চক্রান্ত যদি রুখতে হয় তবে সবরকম কর-দর, বিদ্যুৎ মাশুল, কোর্ট ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসতে হবে।

ইতিহাসের বিকৃতিসাধন

সাতের পাতার পর

ও আমেরিকা এই দুই শক্তির বন্ধুত্বকে মহিমময় হিসাবে চিত্রিত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাফাই গাইবার পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।

আমরা জানি, ইতিহাসের বিকৃতিসাধনই মানবসভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের উত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। জার্মানিতে এই শ্লোগান তোলা হয়েছিল, আর্যরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, ইহুদীদের বাঁচবার অধিকার নেই। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ নারী শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল বিশুদ্ধ আর্যরক্তের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এখানেও সেই কাজে বদ্ধপরিকর হয়ে নেমেছে বিজেপি। শ্লোগান তুলছে হিন্দুত্বের, হিন্দুরাই শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে তারাই থাকবে সব অধিকার নিয়ে। মুসলিম সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারতবর্ষে থাকতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে। এটা আবারও পরিষ্কার হয় NCERT-র পরামর্শদাতা অতুল রাওয়াতের কথায়। তিনি বলেছেন, "আজ সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা জাতি হিসাবে জার্মানি ও তার জনগণ সম্পর্কে ভারতীয় ছাত্রদের মনে সদর্থক ধারণা ও সুষম দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন।" আর এস এস-এর মতাদর্শের সাথে এই বক্তব্য মেলালেই ধরা পড়ে যে, 'জার্মান জাতি' কথাটার আড়ালে তিনি নাৎসী মতবাদ সম্পর্কেই 'সদর্থক ধারণা'র কথা বলেছেন যেটা বীভৎস ইহুদী বিদ্বেষের জমি তৈরি করেছিল আর্য শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা উড়িয়ে। বিজেপি'র হিন্দুত্বের চরিত্র ও লক্ষ্যও তেমনই। 'নিজের ধর্মকে ভাল, অন্যের ধর্মকে খারাপ' বলে ভাবার ও দেখানোর যে প্রবণতা সাধারণভাবে ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়, বিজেপি'র হিন্দুত্ব সেটা নয়। তারা হিন্দুত্বকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে দেখাতে চায় — শুধু অপরের ধর্মকে খাটো করার জন্যই নয়, সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের জমি তৈরির জন্য। নাহলে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে তারা ইতিহাসকে বিকৃত করার পথে যেতনা। হিটলারের নাৎসীবাদ যেমন জনগণের কল্যাণের নামে, জনগণকে ভুলিয়ে হিটলারের নেতৃত্বে পুঁজিপতিদের স্বার্থে জার্মানীকে ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদের দিকে ঠেলে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল, ভারতবর্ষে বিজেপি'র হিন্দুত্বের লক্ষ্যও সেটাই। তিন বছরের বিজেপি শাসন প্রমাণ করেছে, তাদের হিন্দুত্ব এমনকি ৮৫ কোটি হিন্দু জনগণের জন্য নয়, বরং জনস্বার্থ বলি দিয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় বিজেপির নেতৃত্বে দেশকে সভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net